রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাদম্বরী ------ ঘটনার অন্তরালে
শেষ পর্ব

স্ত্রীর এই মৃত্যুকে জ্যোতিরিন্দ্র কিভাবে গ্রহন করেছিলেন, সে কৌতুহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। কাদম্বরীর মৃত্যুর এক মাস পরেই তিনি জ্ঞানদানন্দিনী, সুরেন্দ্র, ইন্দিরা ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সরোজিনী জাহাজে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে "তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন।" কিন্তু না, কাদম্বরীর জীবনাহুতি জ্যোতিরিন্দ্রকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তা না হলে তিনি জীবনের কাছে এভাবে পরাজিত হতেন না। শুধু ব্যবসাতেই যে তিনি পর্যুদস্ত হয়েছেন তাই নয়, তার মতো নাট্যকার কাদম্বরী চলে যাওয়ার পর মৌলিক রচনা বাদ দিয়ে সারাটা জীবন শুধু অনুবাদ নিয়ে কাটিয়ে দিলেন? জমাটি আড্ডার আসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন নির্বাসনে। নিজেকেই ভুলে থাকতে চাইতেন হয়তো তিনি। জ্যোতিরিন্দ্রের চারিত্রিক দুর্বলতার কোন সুনিশ্চিত প্রমান কখনও কেউ দিতে পারেননি। মর্হষি তার ছেলে মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এবং তার সন্তানরাও সে আর্দশ মেনে চলেছিলেন। যদিও সে সময় কোলকাতায় বাবু কালচারে নৈতিকতার চরম অধঃপতনের সময় বিরাজ করছিল, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মানুষরা ছিল তাদের থেকে আলাদা। কাদম্বরী যখন তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন তার বয়স ছিল মাত্র পয়ত্রিশ বছর। কিন্তু তিনি জীবনে দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। প্রচন্ড অনুশোচনা ছিল তার মধ্যে। কেউ তাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলেই তিনি জবাব দিতেন, "তাকে ভালবাসি।" স্বেচ্ছা নির্বাসনে রেখে তিলে তিলে শাস্তি দিয়েছেন নিজেকেই। শাস্তি দিয়েছেন কাদম্বরীর প্রতি উদাসীন স্বামী জ্যোতিকে। শোনা যায় কিছুদিনের জন্য তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন।

যদিও তার রচনায় কাদম্বরীর কথা আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। এমনকি তার লেখা "আমার জীবনস্মৃতি" কিংবা শেষ বয়সের ডায়রীতেও তার মনের কোন কথা ধরা নেই। আমার জীবনস্মৃতি" তে দু'একটি জায়গায় রেফারেন্স হিসেবে ছাড়া কোথাও কাদম্বরীর কোন উল্লেখ নেই। অথচ রাচীতে তার নিজ বাড়ি শান্তিধামের যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন, তার দেয়ালে একটিমাত্র ছবি টানানো ছিল, তার নিজের হাতে আকা কাদম্বরীর পেন্সিল স্কেচ। যদিও রবীন্দ্র ভাইজি ইন্দিরা লিখেছেন, "নতুন কাকিমার

নিজের হাতে আকা একটি পেন্সিলের ছবিই সেই ঘরের একমাত্র সজ্জা ছিল” তাতে স্পষ্ট হয় না ছবিটা কার হাতে আকা ছিল। ঠাকুর বাড়ির অনেক মেয়ে - বউই ছবি আকতে জানতেন, হয়তো কাদম্বরীও জ্যোতির কাছে ছবি আকতে শিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র সেই ছবিটিই ঘরে টানিয়ে রেখেছিলেন। নিরাবরন নিরাভরন গৃহের একমাত্র সজ্জা। এই আপাত ভুলে থাকা হয়তো নয় ভোলা। হয়তো সে কারনেই কবিগুরু লিখেছিলেন, চলে যাওয়া মানেই প্রস্থান নয় ....। একা থেকে জ্যোতি হয়তো বারবার সেই অসামান্যা নারীর উপস্থিতি অনুভব করতে চেয়েছিলেন।

কেউ কেউ অবশ্য এটাও ভাবতে পছন্দ করতেন যে, কোন এক না বলা কারন নিয়ে রবি আর জ্যোতির মধ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এর কারন হিসেবে তারা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি আর নতুন বৌঠানের আত্মহত্যাকে এক সূতোয় বুনতে চান। কিন্তু দুটি কারনকেই সে সময়ের বাস্তবতা দিয়ে বিচার করলে অসার মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঈর্ষার কোন কারন ছিল না, তিনি তখন জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন, সংসারের মোহ মায়া কাটিয়ে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ সব সময়ই ছিল। কাদম্বরীর মৃত্যুর পর দুই ভাই এক সাথে সরোজিনী জাহাজে করে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সে সময় দুইভাই সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে বহুদিন বাস করেছেন। জ্যোতির লেখা শেষ বয়সের ডায়রীতে রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ এসেছে ঘুরে ফিরে অনেকবার। রবীর দাড়ি রাখা, বক্তৃতা, গান কিছুই তার চোখ এড়ায়নি। এমনকি তিনি রবীর ছবিও একেছেন, রবীর তেষট্টি বছরের জন্মদিনে পচিশ - ছাব্বিশ জন অতিথির সামনে “বাল্মীকি প্রতিভার” গান গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন, শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছেন, শান্তিনিকেতন তাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিল যে সেখানে তিনি বাড়ি কেনার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু সে সময় জ্যোতি আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলেন, সে কারনে অনেক কিছুর সাথেই তার যোগাযোগ নষ্ট হচ্ছিল।

অন্যদিকে জ্যোতিদাদাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোতেও দেখা যাবে অন্তরংগতার সুরেরই মূর্ছনা। দাদার ছবির এ্যালবাম ছেপে দেয়ার আগ্রহী ও উদ্যোক্তা তিনি। মূল নাটক লেখা ছেড়ে শুধু অনুবাদ নিয়ে পড়ে থাকা দাদাকে তিনি মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে লিখেছেন, “আপনিতো সংস্কৃত নাটক প্রায় শেষ করে ফেললেন”। প্রায় সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পান, তার নিজস্ব ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এছাড়া তার নিজের পারিবারিক জীবনেও নেমে আসে নানা দুর্ভোগ। স্ত্রী - পুত্র কন্যাদের মৃত্যু, শান্তিনিকেতন নিয়ে সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে বিব্রত কবি তখন

নিজের তেমন কোন আত্মীয় স্বজনদের সাথেই যোগাযোগ রাখতে পারছিলেন না। আর সংসারত্যাগী জীবনবিবাগী জ্যোতিতো তখন আরো দূরের মানুষ। তাই কাদম্বরীর মৃত্যু দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, একথাটা বোধ হয় এখানে বেমানান। জ্যোতিরিন্দ্র খুজে ফিরেছেন সারাবেলা বিদেহী কাদম্বরীকে আর রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, ছবিতে মিশে ছিলেন তিনি আজীবন।

এই অভিমানীনি নিজের হাতে জীবন প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে অন্তরালে না চলে গেলে হয়তো ঠাকুরবাড়ীর নারীদের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। ঠাকুরবাড়ীর অন্তপুরে সে সাহিত্য - সাংস্কৃতির একটি ফল্গুধারা বইছিলো তা অন্তত আরো কিছুদিন এভাবেই বইতো। তার মৃত্যুর পর থেকেই জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর সোনালি দিনগুলো শীতের পাখির মতো বিদায় নিল। সব মিলে কাদম্বরী আজ সবার কাছে বাস্তব আর কল্পনায় মেশা একটি চরিত্র হয়ে আছে। কবিই বলেছেন “অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা”। রোমান্টিক স্বপ্ন সঞ্চারিনী নতুন বউঠানের মাঝে মানবী কাদম্বরী হারিয়ে গেছেন। সমসাময়িক ব্যাক্তিদের সাক্ষ্য এবং কবিদের কবিতা থেকে ধরে নেয়া যায়, কাদম্বরীর মৃত্যুর সাথে রবীন্দ্রনাথের বিয়েকে জড়িয়ে যে অনুচিত কল্পনা মানুষের মাঝে দোলা দেয়, আসলে হয়তো তা ভিত্তিহীন।

এই লেখাটির জন্য জোড়াসাকো থেকে পৃথিবীর পথে - বাসব ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির কথা - হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল - চিত্রা দেবের বইগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

তানবীরা তালুকদার
০৮.০৭.০৮